ISSN 2519-6030

উত্তরা ইউনিভার্সিটি

লেখনী

ভাষা,সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল

Lekhani : A Journal of Language, Literature and Culture

প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৩
Volume 1, January 2017

Uttara University

তাছনিম আক্তার*

শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ : *ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষার প্রতি সমাজদৃষ্টির নিবিড় বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে। রবীন্দ্র মননে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ, মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ, চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তির মিলন, ভাষার সঙ্গে ভাবের যোগ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, অর্থাৎ জীবনপ্রবাহের গতির সঙ্গে শিক্ষাকে এক অক্ষে রেখে শিক্ষামুখী জীবন নয়, জীবনমুখী শিক্ষা প্রদান করা। একই লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বজাগতিক মহামিলন যজ্ঞের কেন্দ্র করে নির্মাণ করেছেন শান্তিনিকেতন ও বিশ্ব ভারতী। মিলনের এই মহাযজ্ঞের মঞ্চে তিনি বিদ্যাদানের কথা কমই বলেছেন, সারাজীবন বলে গেছেন শিক্ষার কথা। কেননা, বিদ্যা আর শিক্ষা দু'টোকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখেছেন। বিদ্যা আহরণের বস্তু, কিন্তু শিক্ষার আচরণের। অর্জিত বিদ্যার সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ ঘটানো শিক্ষার কাজ। কিন্তু আমাদের দেশীয় শিক্ষা প্রণালীতে চিত্তের গতিকে মূল্যয়ন না করে সনাতন পদ্ধতির ভেতরে আমদানি করা হয়েছে বিলেতি বিদ্যা। বিলেতি বিদ্যা ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি ও আলো বাতাসের সঙ্গে খাপ না খাওয়া সত্ত্বেও সভ্য হওয়ার বাসনায় বিদ্যার এই আমদানি। শিক্ষার এরূপ যান্ত্রিকতাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো পছন্দ করতেন না। যান্ত্রিক শিক্ষায় প্রতিটি মানুষ কলে ছাঁটা বিদ্যা নিয়ে জীবনের অর্ধেক সময় পাঠ মুখস্ত করার মধ্যে দিয়ে পার করে দেয়। বিদ্যাদানের অভিনব কৌশল স্বরূপ আমদানি করা বিলেতি স্কুলের ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষা দানের কল। স্কুলের মাস্টার এই কলের একটা অংশ। বিদ্যা কলে উৎপন্ন হতে পারে বিদ্যার পণ্য কিন্তু চলনশীল মন ও প্রাণের যোগ না থাকায় বিদ্যার এই কলে শিক্ষা উৎপন্ন হয় না। তাই ইউরোপীয় বিদ্যালয়ের অবিকল নকল না করে আমাদের সমাজের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, আমাদের দেশীয় শিক্ষাকে সংলগ্ন করে তুলেতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিলেতের বিদ্যালয়ের নজির একবারে এড়িয়ে যেতে হবে, কেননা বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজের সাথে আমাদের সমাজ-ইতিহাসের তেমন কোনো মিল নেই। এজন্যই বিদ্যালয়ের এদেশীয় প্রতিরূপটি কেমন করে আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলেয়ে নেওয়া যায় তার একটি স্বচ্ছ পন্থা বের করতে হবে। শিক্ষাকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না করে, গেইট দ্বারা রুদ্ধ না করে, দারোয়ান দ্বারা পাহারা না বসিয়ে, সময় দ্বারা তাড়া না করে, শাস্তি দ্বারা কণ্ঠকিত না করে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদানের জন্য গুরুগৃহ তপোবন প্রত্যাশ্যা করেছেন। আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় থেকে দূরে, নির্জনে, মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা জ্ঞানচর্চার মহামিলন যজ্ঞের মধ্যে হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশের কলে ছাঁটা বিদ্যার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাস্টারমশাই হয়ে উঠেন, গুরু হতে পারেন না। এইসব মাস্টারমশাই হলেন শিক্ষার দোকানদার, তারা শিক্ষা নামের পণ্যকে বেতন গ্রহণের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করেন। এমতাবস্থায় বেতন-ভোগী দোকানী মাস্টারমশাই দ্বারা চালিত বিদ্যালয় ইঞ্জিনে পরিনত নয়। তাতে বস্তু উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু প্রাণ উৎপন্ন হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে কোনো বহিরাগত নিয়ম, বিধি বা প্রণালি নয় ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ, পরিবেশের সাথে সাম্যঞ্জস্য করে শিক্ষাদান করতে হবে। যেখানে নিভৃতে তপোস্যা হয়, যেখানে গোপনে ত্যাগ এবং সাধন করে শক্তিলাভ করা যায়, যেখানে অধ্যাপকেরা জ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত সেখানে ছাত্ররা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হতে পারে। 'শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার এই বিশেষ দিকটি উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।*

*স্নাতকোত্তর (অবতীর্ণ) শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশ

পরাধীন ভারতবর্ষের স্বরাজ, স্বাধীনতা, দৈন্য-দুর্গতি, পশ্চাৎপদতার সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপমহাদেশটিতে মূল সমস্যা নীতি-নিয়মের আধিক্য লালিত শিক্ষাব্যবস্থায়ও স্থিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মননে এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্টিশীল সাহিত্যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসারতার বিপরীতে যুক্তিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলি। বিজ্ঞানের দুইটি বিশিষ্ট উপাদান যুক্তি ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের ইতিহাস-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতির উপযোগী করে এবং বৈশ্বিক চিন্তার সৃজনী প্রতিভার সমন্বয়ে নির্মাণ করেছিলেন একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তির সঙ্গে স্বদেশের মাটি ও মানুষের যোগ, মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ, বইভিত্তিক পাঠদানের সঙ্গে তপস্যার যোগ, স্মরণশক্তির সঙ্গে কল্পনা ও চিন্তাশক্তির যোগ, ভাষার সঙ্গে ভাবের যোগ, বিজাতীয় ভাষা নয় মাতৃভাষার সঙ্গে শিক্ষাদানের ভাষার যোগ প্রভৃতি। অর্থাৎ জীবন প্রবাহের গতির সঙ্গে শিক্ষাকে এক অক্ষে রেখে শিক্ষামুখী জীবন নয়, জীবনমুখী শিক্ষা প্রদানের ওপর জোর দিয়েছেন। একই লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বজাগতিক মহামিলন যজ্ঞের কেন্দ্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন শান্তিনিকেতন (১৯০১) ও বিশ্বভারতী (১৯১৮)। এ প্রসঙ্গে খান সারওয়ার মুরশিদ বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে শিক্ষা বিষয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, নিজে শিক্ষকতা করেছেন এবং শিক্ষার যে আদর্শ তিনি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তা রূপায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বিশ্বভারতী তাঁর অনেক কামনার এবং আশার প্রতীক। (মুরশিদ, ১৯৯৫ : ১৫)

মিলনের এই মহাযজ্ঞের মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাদানের কথা কমই বলেছেন, সারাজীবন বলে গেছেন শিক্ষার কথা। কেননা বিদ্যা আর শিক্ষা দু'টোকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখেছেন। বিদ্যা আহরণের বস্তু কিন্তু শিক্ষা আচরণের। অর্জিত বিদ্যার সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ ঘটানো শিক্ষার কাজ। কিন্তু আমাদের দেশীয় শিক্ষাপ্রণালীতে চিত্তের গতিকে মূল্যায়ন না করে আমদানি করা হয়েছে বিলেতি বিদ্যা। বিলেতি বিদ্যা ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি, আলো-বাতাসের সঙ্গে খাপ না খাওয়া সত্ত্বেও সভ্য হওয়ার বাসনায় বিদ্যার এই আমদানি।

শিক্ষার এরূপ যান্ত্রিকতাকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেন নি। যান্ত্রিক শিক্ষায় প্রতিটি মানুষ কলে ছাঁটা বিদ্যা নিয়ে জীবনের অর্ধেক সময় পাঠ মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে পার করে দেয়। পাঠ্য বইয়ের এরূপ মুখস্থ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ না থাকায় বইয়ের বিদ্যা বইয়েই থেকে যায়, তা জীবনের পক্ষে শিক্ষার যথার্থতা নিয়ে সংযুক্ত হতে পারে না বলে মত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে। আজও পর্যন্ত চালিত বিদ্যাদানের অভিনব কৌশল স্বরূপ আমদানি করা বিলেতি স্কুলের ধারণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে আরও বলেছেন :

> ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার কল তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চারপাতা কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়। (ঠাকুর, ২০০০ : ৬৭৭)

আমদানিকৃত বিলেতি বিদ্যার কলে উৎপন্ন হতে পারে বিদ্যার পণ্য কিন্তু চলনশীল মন, আনন্দহীন শিক্ষা ও প্রাণের যোগ না থাকায় বিদ্যার এই কলে শিক্ষা উৎপন্ন হয় না। অপরদিকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এই ধারণাগুলো ইউরোপীয়। ইউরোপের সাথে আমাদের ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতির সাযুজ্য না থাকায়, ইউরোপের বিদ্যার নকল দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের কোনো উপকারে আসছে না এবং ইউরোপের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব সৃজনশীল মানুষ বের হচ্ছে, তারা ইউরোপীয় সমাজের ভেতর থেকেই মানুষ। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় তাদের যৎসামান্যই সাহায্য করছে বলে 'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষাভাবনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতকে আমলে নিয়ে যদি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব ধুম পড়েছে ইউরোপীয় বিদ্যাদানের, যেখানে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু ইংরেজি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। মাস্টার ছাত্র ভাবশিক্ষার মাধ্যমে ভাষার রস আস্বাদন করতে অনাগ্রহী। তাদের একমাত্র লক্ষ্য টানিয়া-বুনিয়া কোনো মতে একটা অর্থ বুঝে পরীক্ষায় পাস করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাকরি জোটাতে হবে। এক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যে ইউরোপের অনুকরণে আমরা আজো পর্যন্ত মত্ত, সেই ইংরেজ জাতির জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-অর্জনে অগ্রগতির একমাত্র কারণ হচ্ছে স্বদেশের সমাজ-ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য নির্ভর শিক্ষা, যে শিক্ষা প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে জীবনের সঙ্গে। এই স্থলে আমরা ইউরোপের অবিকল নকলে ব্যস্ত, কিন্তু এই নকল দ্বারা নতুন কিছু নির্মাণ হয় না, কেবলই গ্রহণের বোঝা বাড়ে এবং সৃষ্টি হয় মানসিক দাসত্ব। এই মানসিক দাসত্বের কারণে আজও আমাদের ইংরেজ প্রীতি দূর হয় নি, যার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭০ বছর এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৪৬ বছর পার হলেও আমাদের উচ্চশিক্ষাঙ্গনে শিক্ষাদান মাতৃভাষার মাধ্যমে করা সম্ভব হয় নি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষাবিধি' সহ অন্যান্য প্রবন্ধে এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ কাহিনি সম্বলিত নানা গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যথার্থতা উল্লেখ করে বলেছেন :

> উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে, তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি , গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায় যে খায় প্রচুর তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখিতে আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপূর্তি করে না। (ঠাকুর, ১৯৯৫ : ৫১৬)

তাই দেখা যায় দেশের বিশ্ববিদ্যলয় থেকে আমরা যে শিক্ষালাভ করি এতে জীবন মন ও আত্মার বিকাশ ঘটে না-আমাদের আচার ও আচরণে শিক্ষার কোনো লক্ষণই প্রকাশিত হয় না। আমরা সবাই একই কলের ছাঁদে তৈরি হই মানুষ হই না।

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের সহজ দৃষ্টিতে শিক্ষাপদ্ধতির যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে, তার মধ্যে শিক্ষার অস্বাভাবিকতা ও আনন্দহীনতাই প্রধান। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আনন্দহীন কেননা তা অস্বাভাবিক, কারণ মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন নয়। মাতৃভাষার রস বঞ্চিত শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর অন্তর অপুষ্টই থেকে যায়। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষা জিনিসটা মানসিক আহার ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, জীবন বাঁচানোর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, কিন্তু সেই খাদ্যটা হজমের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ হাওয়া খাওয়া দরকার। খাদ্যের এই উদ্বৃত্ত অংশ অর্থাৎ হাওয়া খাওয়াকে শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষার ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্যের অভাবে আমাদের সমস্ত জীবন ব্যয় করা বিদ্যা জীবন ও জগতের কোনো কাজে আসে না। যদিও রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্যের সঙ্গে বিষয়ী ও প্রবীণেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। কারণ তারা বলবেন এই কলে ছাঁটা বিদ্যার দ্বারাই আমরা বড়ো চাকুরে হতে পেরেছি, মোটা অঙ্কের বেতন পাচ্ছি এটাই তো সার্থকতা। কলে ছাঁটা এই বিদ্যাধারীদের বিদ্যাদানের সমস্ত প্রণালির মধ্যে নকলের এত প্রাচুর্য যে তাদের মধ্যে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, সমাজের প্রতি কোনো দায়ভার সৃষ্টি হয় না। নিজ দেশ-সমাজ-ইতিহাস-সংস্কৃতি-ভাষা সাহিত্যের প্রতি দায়ভার সৃষ্টি করাও ছিল রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে স্বাধীন পাঠ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন :

> যতটুকু আবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যকশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরারর জন্যে অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও একই কথা ঘটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়। (ঠাকুর, ২০০০ : ৬৬৬)

যে-শিক্ষায় আনন্দ নেই, প্রাণ নেই আর যে শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মস্থ না করে শুধু তোতাপাখির মতো কতগুলো নিরস বুলি মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এ-শিক্ষাকে বলেছেন কৃত্রিম ও গোলামির শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে আরও বলেছেন :

আমাদের নিরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কতগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতী সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজি ভাব রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলো একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সেগুলোকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না। বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না। (ঠাকুর, ২০০০ : ৬৬৯)

জ্ঞান মানুষকে উদার করে, সংকীর্ণতা হতে, হীনম্মন্যতা হতে, ক্ষুদ্র গণ্ডি হতে, ক্ষুদ্র বুদ্ধি হতে জগতে ও আলোকে টেনে নেয়। কিন্তু আজ আমরা যে শিক্ষা পাই সে শিক্ষায় দিন দিন আমরা শিকড়চ্যুত হয়ে, দেশ, মাটি এবং দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছি। রবীন্দ্রনাথ শিকড়চ্যুত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছেন :

কিন্তু শিক্ষার এই পদ্ধতির কারণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দোষারোপ করেন নি। কেননা ছাত্রদের গ্রন্থজগত এক প্রান্তে এবং বসতিজগত অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। ব্যাকরণ-অভিধানের এই ব্যবধান ঘুচিয়ে যথার্থভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভাষাশিক্ষার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাতে করে শিক্ষার্থীর চিন্তা ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন বিকাশের মাধ্যমে নতুনত্বের স্বাদ পাবে এবং তাদের মানসিক দাসত্বও ঘুচবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিন্তা দ্বারা কখনোই পাশ্চাত্য শিক্ষা বা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করেন নি। 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন বিলেতি বিদ্যাকে পরিহার করতে, সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের এদেশীয় প্রতিরূপটি কেমন করে আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় তারও একটি উপর্যুক্ত পন্থা বের করতে হবে। আমাদের শিক্ষা যে একদিন মাটি, মানুষ ও জীবনের অনুষঙ্গ ছিল তারই দ্বারস্থ হতে বলেছেন তিনি। শিক্ষাকে প্রাচীর বদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মতে শিক্ষাকে গেইট দ্বারা রুদ্ধ না করে, দারোয়ান দ্বারা পাহারা না বসিয়ে, সময় দ্বারা তাড়া না করে, শাস্তি দ্বারা কণ্ঠকিত না করে বিশ্বপ্রকৃতির আতিথ্যেই বিশালতার মধ্যেই বাল্যকাল থেকেই লালিত হবে শিক্ষার্থীরা। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সমর্থন করে সফিউদ্দিন আহমদ বলেছেন :

> দেশকে ভালোবাসা মানে দেশের ভাষা ও সাহিত্যকেও ভালোবাসা। কিন্তু আমরা মুখে দেশপ্রেমের কথা বলি আবার সর্বক্ষেত্রেই সাহেবীপনার বাহাদুরীও করে থাকি। অথচ দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখি। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষার বিরোধিতা করেননি। যেখানে ইংরেজির প্রয়োজন ও আবশ্যক সেখানে তিনি অবশ্য ইংরেজি ব্যবহারের পক্ষে। (আহমদ, ১৯৯৯ : ৭৫)

তাইতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাদানের জন্য গুরুগৃহ এবং তপোবন প্রত্যাশী। গুরুগৃহে ছাত্ররা ব্রহ্মচর্যা পালনের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে, কিন্তু আজকাল ব্রহ্মচর্যা পালনের নামে নীতি-পাঠের যে আধিক্য তার বিরোধিতা করেছেন তিনি। কেননা ব্রহ্মচর্যা পালন করা মানে উপদেশ পালন করা নয়। ব্রহ্মচর্যা পালনের দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্যে থেকে আকাশের মতো বিশাল হতে, তরুর মতো উদার হতে, বায়ুর মতো নির্মল হতে, জলাশয়ের মতো স্বচ্ছ হওয়ার শক্তি লাভ করা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির এই অতুলনীয় আতিথ্য পাঠ্যবই, চেয়ার, টেবিল, বোর্ড প্রভৃতির চেয়ে কম অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন নি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে অজয় রায় যে-মন্তব্যটি করেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করছি :

> রবীন্দ্রনাথই সম্ভবত একক যিনি শুধু, জীবনবোধসিক্ত করার কথা ভাবেননি, একে বাস্তব রূপ দেবার জন্য একটি... বিদ্যায়তনও গড়ে তুলেছেন-যার নাম শান্তিনিকেতন। আনন্দ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিদ্যাচর্চার যে ব্যবস্থা তিনি করাতে চেয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যাচর্চা ও জীবনচর্চাকে একাত্ম করে তুলতে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাচর্চা হলো জীবনচর্চার অপর নাম। তাই শান্তিনিকেতনকে ঘিরে এক জীবনে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন- যে জীবন থেকে শুধু জ্ঞানার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান লাভ করবে না শিক্ষাকরাও শিখবে।... একই উদ্দেশ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন শ্রীনিকেতন। শ্রীনিকেতন হলো রবীন্দ্র শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োগকেন্দ্র, যেন গবেষণাগার শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন মিলে শিক্ষা ও জীবন যেন পরস্পরকে ধারণ করে রাখার প্রয়াস। আবার প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান ব্যবস্থাকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতী গড়ে উঠলো যা বিশ্ব মানবতার জন্য উন্মুক্ত আর এই ত্রয়ীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতা, যার মাধ্যমে বিদ্যা ও শিক্ষা জীবনকে স্পর্শ করতে জ্ঞান ও বিদ্যা মানবতাবোধকে, তার সৃজনশীলতাকে ধারণ করবে। এই তো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন। (রায়, ১৯৯৫ : ১২)

তাই রবীন্দ্রনাথের মতে, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় থেকে দূরে, নির্জনে, মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা জ্ঞানচর্চার মহামিলন যজ্ঞের মধ্যে বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশের কলে ছাঁটা বিদ্যার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাস্টারমশাই হয়ে উঠেন, গুরু হতে পারেন না। এইসব মাস্টারমশাইরা হলেন শিক্ষার দোকানদার, তারা শিক্ষানামের পণ্যকে বেতন গ্রহণের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করেন। এমতাবস্থায় বেতন ভোগী দোকানি মাস্টারমশাই দ্বারা চালিত বিদ্যালয় ইঞ্জিনে পরিণত হয়। তাতে বস্তু উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু প্রাণ উৎপন্ন হয় না। প্রাণের এই আবেগ এবং চলনশীল মনের অভাবে শিক্ষার আদান প্রদানে কোন আনন্দ থাকে না। আনন্দহীন বস্তু নির্জীব ও শুষ্ক। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা আপন মাহাত্ম্য গুণে দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়িয়ে যান। তাদেরকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গুরু। শিষ্য ব্রহ্মচর্যা পালন করে শিক্ষা সমধান করবে বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। কালে কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হোক না কেন, এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হবে না। কারণ এ নিয়ম মানব চরিত্রের নিত্যসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান কালে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেইগুরু জীবনই অত্যাবশ্যক, যিনি নিজের জীবন দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করবেন , জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের বাতি জ্বালাবেন, স্নেহের দ্বারা কল্যাণ সাধন করবেন। এক্ষেত্রে আমাদের জীবনের লক্ষ্যকে ঠিক করে নিতে হবে, আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা কোন পথে সত্য আকার দান করতে পারব। আমাদের স্মৃতিতে এখনো অত্যুজ্জ্বল হয়ে আছে ভারতের তপোভূমি, সাধকের সাধন কেন্দ্র, সাধুর কর্মস্থান, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে ইউরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের এসব প্রণালির মধ্যে আমাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। তা না হলে পরের অনুকরণ ও নকলের দ্বারা আমরা কেবল বাহিরের ঠাট বজায় রেখে ভিতরের দিকে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ব। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার প্রদান বাহন করে তুলতে হবে, কোনো বিজাতীয় ভাষা দ্বারা স্বদেশ ও সমাজ উপযোগী প্রকৃত শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবের শিক্ষাও প্রদান করতে হবে, তা না হলে সে শিক্ষাও জীবন অসংলগ্ন হয়ে পড়বে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কোনো বহিরাগত নিয়ম, বিধি বা প্রণালি নয় ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করে শিক্ষাদান করতে হবে। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয়, যেখানে গোপনে ত্যাগ এবং সাধন করে শক্তিলাভ করা যায়, যেখানে অধ্যাপকেরা জ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত সেখানে ছাত্ররা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেছেন :

> কোনো মৌলিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন নি। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁকে স্বদেশের শিক্ষা, শিক্ষার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাবতে হয়েছে। তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী সে-ভাবনারই ফল। এগুলোতে তাঁর হৃদয়ের উপলব্ধি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দেশের প্রয়োজন বড়ো হয়ে উঠেছে। তিনি সর্বাঙ্গীণ মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তিনি যে শিক্ষাধারা কামনা করেছেন, তা সেই পরিপূর্ণ মানুষের জন্যে। (আজাদ, ১৯৭৩ : ১২৭)

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ নির্ভর করে সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। শিক্ষা এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতির দুহিতা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার একটি অন্যতম আদর্শ ও লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠু সংস্কৃতির দ্বারা মানবসভ্যতা ও এর উন্নয়ন এবং অগ্রগতি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় শিক্ষা-সংস্কৃতির যোগ ঘটানো প্রসঙ্গে আবুল মোমেন বলেছেন :

> রবীন্দ্র শিক্ষা-চিন্তার প্রধান অবদান এই যে এ শিক্ষায় বিদ্যার্থী জ্ঞানের সাথে সাথে একটি বিকাশমান সংস্কৃতির ধারায় যুক্ত হয়। এই বিকাশমান সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিরোধ স্পৃহা ও শক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে তখনই জাতীয় পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত হতে পারবে যখন দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি হবে অন্যের নির্ভর।... এর জন্যে চাই যথোপযুক্ত শিক্ষা, যে শিক্ষারই রূপরেখা তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ তাঁর গানসহ সাংস্কৃতিক বৈভব নিয়ে যে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক লড়াই চলছে তাঁর শিক্ষাচিন্তার রূপায়নও তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। (মোমেন, ১৯৮৭ : ৬৮-৬৯)

রবীন্দ্র প্রবর্তিত শিক্ষাভাবনার যথার্থ প্রয়োগের অভাবে ভারতবর্ষের তথা আমাদের দেশেও বিকৃত চিন্তা, সংস্কৃতি ও ভাষার চর্চা পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষক এবং সৃজনী ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের অভাব থাকার কারণে শিক্ষার কাজ চলছে সাদা-কালোর বিভেদজ্ঞানহীন চর্মচক্ষুবেষ্টিত একদল দোকানি মাস্টার দ্বারা। আর এই দোকানি মাস্টারাই পরিক্রমা থেকে পরিক্রমায় জায়গা করে নিচ্ছেন শিক্ষাদানের নিচ থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত। তাইতো পাঠশালার ছেলেমেয়েরা আজও বেত সহযোগে মাস্টারমশাই দেখে ভয়ে শিহরিত হয়ে বুঝে না বুঝে পাঠ মুখস্থ করে এবং পরীক্ষার খাতায় পেট খালি বমি করে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদানের এরূপ প্রণালিকে কখনো সমর্থন জানান নি। তাই সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর সমস্ত রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গোটা বিশ্বের কাছে তাঁর প্রবর্তিত স্বতন্ত্র শিক্ষাচিন্তার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। সৃষ্টিশীল, উদার, আধুনিক স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন শিক্ষামণ্ডলী, প্রকৃতির আতিথ্যে লালিত বিদ্যালয় এবং রাজনৈতিক-সামাজিক বর্হিচাপ মুক্ত পরিবেশ, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয়, শিক্ষাদানের জন্য যথার্থ মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের নির্মাণ প্রভৃতি অবকাঠামোর ওপর রবীন্দ্র-প্রবর্তিত শিক্ষাচিন্তার সাফল্য নির্ভর করবে বলে আমরা মনে করি।

তথ্যনির্দেশ

আজাদ , হুমায়ুন (২০০৪) । রবীন্দ্রপ্রবন্ধ রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা । ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ;

আহমদ , সফিউদ্দিন (১৯৯৯) । রবীন্দ্রনাথের ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা । ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্য ভবন ;

ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ (২০০০) । 'শিক্ষার হেরফের' । প্রবন্ধসমগ্র । ঢাকা : সময় ;

ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ (২০০০) । 'শিক্ষা সমস্যা' । প্রবন্ধসমগ্র । ঢাকা : সময় ;

ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৫) । 'শিক্ষার বাহন' । রবীন্দ্র রচনাবলী ১৮ খণ্ড । । বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ;

মুরশিদ , খান সারওয়ার (১৯৯৫) । 'প্রধান অতিথির ভাষণ' । শিক্ষাবার্তা । সম্পাদনা : আফরোজেন নাহার রাশেদা ;

মোমেন , আবুল (১৯৮৭) । 'আমাদের সংকট ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' । নানা রবীন্দ্রনাথের মালা । সম্পাদনা : আবুল হাসনাত : ঢাকা : বাংলা একাডেমি ;

রায় , অজয় (১৯৯৫) । 'আলোচনা' । শিক্ষাবার্তা । সম্পাদনা : আফরোজেন নাহার রাশেদা । ঢাকা ।